Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা-ভাবনা ও ব্যাকরণ-ভাবনা

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাখাওয়াৎ আনসারী
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.7
Pages	121-162
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা-ভাবনা ও ব্যাকরণ-ভাবনা

সাখাওয়াৎ আনসারী

এক—ভূমিকা

আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা রাজা রামমোহন রায় মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে পরাধীন ভারতবর্ষে ১৭৭৪[১] খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৫৯ বছর বয়সে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই স্বল্পায়ুর মধ্যেই বহু বিচিত্র প্রতিভার অমিত দ্যুতিতে তিনি আলোকিত করেছেন ভারতবর্ষকে। ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং বাংলা গদ্যচর্চার অগ্রদূত হিসেবে সাধারণ্যে তাঁর প্রধান পরিচয় চিহ্নিত হবার কারণে তাঁর অন্যান্য বহু পরিচয় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে রয়ে গেছে অনেকখানিই অজ্ঞাত। রাষ্ট্রচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, স্বাধিকার চেতনা ইত্যাকার বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন অধিকতর গবেষণার দাবী রাখে। ভাষা-ভাবনা ও ব্যাকরণ-ভাবনা সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। এ ভাবনা মূল্যায়নের অযথাযথতার কারণও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথমত রামমোহন শুধুমাত্র বৈয়াকরণই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। এমন একজন বৈয়াকরণ ও বহু ভাষাবিদের পাণ্ডিত্য সম্যক উপলব্ধির জন্যে যে পরিমাণ জ্ঞানের ভিত্তি প্রয়োজন তা সাম্প্রতিক কালের বহু ব্যক্তির মধ্যেই দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়ত এ সকল ভাষা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ও নানাজনের সাথে আলাপচারিতায়। রামমোহন রচনাবলী প্রকাশিত হলেও তাঁর সকল বক্তব্যই একটিমাত্র গ্রন্থেই সুসংগ্রথিত নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ থেকে জড় করে এ ভাবনাকে সংবদ্ধ করা যথেষ্ট দুরূহ। তৃতীয়ত রামমোহনের অনেক বক্তব্যই তাঁর কালের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটেই তাঁর রচনার মান বিচার্য। চতুর্থত তাঁর রচনার ভাষাগত দুর্বোধ্যতা। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃতসহ বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ না হলে একজন গবেষক তার পূর্ণাঙ্গ ভাবোপলব্ধিতে ব্যর্থ হবে। অধিকন্তু, তিনি যে গদ্যে বাংলা ভাষার গ্রন্থ-প্রবন্ধ লিখেছেন তা বাংলা গদ্যের উন্মেষকালের বলে কালগত বিচারে সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। তাঁর ভাষা-ভাবনা ও ব্যাকরণ-ভাবনার বিচার শুধুমাত্র উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ হয়েই সম্ভব।

দুই—রামমোহনের শিক্ষালাভ ও বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন

রামমোহন রায়ের বাল্য বা কৈশোর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে তিনি যখন শিক্ষা শুরু করেন তখন এদেশে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আগমনের এই কালে শিক্ষায়তন বলতে টোল-চতুষ্পাঠী আর মাদ্রাসা-মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বোঝাত।[২] অনেকের মত নিজ গৃহের পাশাপাশি তিনি পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথ লিখছেন:

> "প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় রামমোহন রায়ের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা, ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী এবং মৌলবীদিগের পারসী ও আরবী শিক্ষার স্থান, এই তিন প্রকার শিক্ষার স্থান ছিল।" [নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ৯]

কোন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য ছাড়াই তাঁকে বিদ্যাচর্চা চালিয়ে যেতে হয় :

> "রামমোহনের শৈশবে, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে, বাংলাদেশে পাঠশালায় পড়ার জন্য কোনো প্রকার পুস্তক ছিল না; কারণ ১৮১৮ সালের আগে শিশুপাঠ্য পুস্তক লিখিত বা মুদ্রিত হয়নি। রামমোহনকে মুখে মুখে শ্লোক শুভঙ্করী শিখতে হত, আর তালপাতায় হাতের লেখা মকস্ করতে হয়।" [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৭৯ : ৭৩]

শুধু শিশুপাঠ্য গ্রন্থই বা কেন? বড়দের গ্রন্থ বলতেও তখন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। পদ্যে লেখা চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরই ছিল সম্বল। আর গদ্যগ্রন্থ, বলাই বাহুল্য, একখানিও ছিল না।[৩] এমনই এক যুগ এবং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত মেধাবী রামমোহনের শিক্ষা এগিয়ে চলে। তিনি এতটাই ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে তাঁর শৈশবকালেই গ্রামের লোকজনের মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানান গল্প ছড়িয়ে পড়ে। বিলেত বসবাসকালে ১৮৩২ সালে গর্ডন নামে এক ভদ্রলোকের কাছ লেখা এক চিঠিতে রামমোহন নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছিলেন :

> ". . . with the usage of my paternal race, and the wish of my father, I studied the Persian and Arabic languages . . . agreeably to the usage of my maternal relations, I devoted myself to the study of the Sangscrit and the theological works written in it, which contain the body of Hindu literature, law and religion."[৪]

অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতৃবংশের প্রথা ও পিতার ইচ্ছানুসারেই ফারসি ও আরবি ভাষা শিখেছিলেন এবং মাতৃবংশের প্রথানুসারে সংস্কৃত ও সে ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ

অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি স্বগৃহে ও গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতেই বাংলা, ফারসি ও সংস্কৃত– এ তিনটি ভাষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। পিতা রামকান্ত রায়সহ পিতৃকুলের অনেকেই নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী করেছেন। ফলে তাঁর ফারসি ভাষা শেখার বুনিয়াদ গৃহেই সম্পন্ন হয়েছিল। ফারসি ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং আরবি শেখার জন্যে তাঁকে নয় বছর বয়সে পাটনা প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে সম্ভবত দু'তিন বছর অবস্থান করেন। সেখানেই তিনি আরবি ভাষায় ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন। সদর দেওয়ানী আদালতে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাদানের জন্যে যে সমস্ত মাওলানা নিয়োজিত ছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁদের সাথে পরিচিত হন। এঁদের সাথে আলাপচারিতা ও কোরআন পাঠ করে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে আরবি এবং ফারসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী করে তোলেন। পাটনা থেকে তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শেখবার জন্যে কাশীতে প্রেরণ করা হয়। ১৮২৬ সালে রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেবের এক পত্রের মারফতে জানা যায় যে রামমোহন দশ বছর কাশীতে থেকে সংস্কৃত শিখেছিলেন। অ্যাডাম সাহেবের এ বক্তব্য সত্য বলে মনে হয় না। রামমোহন যে একাদিক্রম দশ বছর কাশীতে থাকতে পারেন না— এ কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। চৌদ্দ বছর বয়সে নিজের গৃহেই রামমোহনের সাথে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার নামে এক ব্যক্তির পরিচয় ঘটে। প্রথম জীবনে শিক্ষক এবং পরবর্তী জীবনে তান্ত্রিক সাধক 'হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিতি লাভকারী এই ব্যক্তির কাছেই রামমোহনের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে অধিকার জন্মে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শনের সাথে তাঁর পরিচয় আরবি, ফারসি ভাষার সূত্রধরে হলেও মূল সংযোগটি স্থাপিত হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই। এদেশে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় অষ্টাদশ শতকের শেষাংশের ফরাসি যুক্তিবাদের গভীর ছাপ লক্ষণীয়। সন্দেহ নেই রামমোহনও এ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেশীয় পণ্ডিতরা ছাড়াও বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তির পত্রাবলী ও আলোচনা থেকে তাঁর বিস্ময়কর ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫] এমন কি "তাঁর ইংরেজি ভাষা বাংলা ভাষার চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছ, আধুনিক ও সংযত ছিল।"[৬] রামমোহন রায়ের বাংলা এবং ইংরেজি রচনা পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে তাৎক্ষণিকভাবেই এ বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করা সম্ভব। তিনি নিজেকে ইংরেজি ভাষাদক্ষ জানতেন বলেই তাঁর সকল পত্রই ইংরেজিতে রচিত।

যতদূর জানা যায় রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করেছেন যথেষ্ট বিলম্বে এবং অন্তত পক্ষে বাইশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা প্রায় কিছুই জানতেন না। এরপর পাঁচ-ছয় বছর ইংরেজি ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও তা অধ্যয়নে তিনি

গভীরভাবে মনোনিবিষ্ট ছিলেন না। ফলে সাতাশ আটাশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁর ইংরেজি দক্ষতা মনের ভাব প্রকাশোপযোগী অত্যন্ত সাধারণমানেরই ছিল। ইংরেজিতে যে সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র, বিতর্ক পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেছেন সে শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন ১৮০১ সালের পর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ১৮০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি ও আরবি ভাষা এবং এ সংশ্লিষ্ট ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নেই বিশেষ অভিনিবিষ্ট ছিলেন।

লর্ড ওয়েলেসলি যখন গভর্নর জেনারেল, তখন ৪ মে, ১৮০০ সালে কোম্পানির উদ্যোগে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আগত সিভিলিয়ানদের বাংলাসহ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পারদর্শী করে তোলার জন্যে এর প্রতিষ্ঠা। এমনই একজন সিভিলিয়ান জন ডিগবি ভারতবর্ষে এসেছেন ১৮০০ সালের ডিসেম্বরে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থী এই ডিগবির সাথে রামমোহনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৮০১ সালে রামমোহনের কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রথম বছরেই। জন ডিগবির সাহচর্যেই তিনি ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন পরিপূর্ণভাবে। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪-র জুলাই মাস পর্যন্ত দশ বছর রামমোহন ডিগবি সাহেবের দেওয়ান হিসেবে রংপুরে কাটান। ইউরোপীয় ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনের বহু গ্রন্থ তিনি ডিগবির কাছ থেকে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। ১৭৯৭ সালে লগ্নি কারবারের সূত্রে অ্যান্ড্রু রামজে নামে কোম্পানির একজন সিভিলিয়ানকে তিনি সাড়ে সাত হাজার টাকা ধার দেন। এটর্নির সাথে চুক্তিপত্র লিখিত হয়। এভাবেই জন ডিগবি এবং অপরাপর সূত্রে সাহেবদের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তাঁর ইংরেজি ভাষাটি বিশেষভাবে রপ্ত হয়। পরবর্তী কালে পাদরীদের সঙ্গে বিচার-বিতর্ক ও রাজনীতিসংশ্লিষ্টতায় তাঁর এ ইংরেজি শিক্ষাটা সুফল বয়ে আনে। তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা ১২ এপ্রিল, ১৮০৯ তারিখের একটি পত্র।[৭] ভাগলপুরে থাকাকালীন জনৈক হ্যামিলটন সাহেবের আচরণের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোকে এ পত্র লেখেন। এ পত্রের ইংরেজি এতটাই সুগঠিত যে ধারণা করা যেতে পারে, এতে তাঁর সুহৃদ জন ডিগবির সংশোধন রয়েছে।[৮] অবশ্য ততদিনে রামমোহন ইংরেজি ভাষার প্রকাশনার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। রামমোহন শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় পারদর্শীই ছিলেন না, তিনি দেশীয়দের আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে পরিচয়ের সেতু রচনাকারী প্রথম বাঙালিও বটে।[৯] এ বৈশিষ্ট্য তিনি অর্জন করেছিলেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই।

রামমোহন রায়ের হিন্দুস্থানি ভাষায়ও ছিল অধিকার। হিন্দি/উর্দু সাহিত্যের চারজন প্রাচীনতম শক্তিশালী লেখকের তিনি একজন। আর তিনজন সদল মিশ্র,

লল্লুজী লাল এবং ইনশা আল্লা খাঁ। এর মধ্যে সদল মিশ্র হিন্দুস্থানি, লল্লুজী লাল গুজরাটি এবং বাকী দু'জন বাঙালি। তাঁর বেদান্ত ভাষ্যের হিন্দি এখন দুর্লভপ্রায়।

ফরাসিদের উদার মতবাদ, মুক্ত সংবিধান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, দর্শন দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফরাসি-প্রীতি রামমোহনকে ফ্রান্সের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। তাঁর নিজের ভাষায় :

> ". . . my heart is with the French people in their endeavours to support the cause of liberal principles. For twelve years past I have entertained a wish (as noticed, I think, in several French and English periodical) to visit a country so favoured by nature and so richly adorned by the cultivation of Arts and Sciences and above all blessed by the possession of a free constitution."[১০]

উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, তিনি ফ্রান্স পর্যটনের স্বপ্ন লালন করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ দেশ সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা জন্মেছিল ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় কিছু সাময়িকপত্র পাঠের মাধ্যমে। এখান থেকেই তাঁর ফরাসি ভাষার দখল সম্পর্কে জানা যায়। তিনি ১৮৩২ সালের শেষের দিকে ফ্রান্স গিয়ে ১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। এ দেশের উপস্থিতি স্বল্পদিনের হলেও অবস্থানকালে ফরাসি ভাষা আরো ঝালিয়ে নেয়ার চেষ্টা থাকাটা তাঁর মত একজন জ্ঞানান্বেষীর জন্যে অস্বাভাবিক নয়। রামমোহন বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দুস্থানি (হিন্দি/উর্দু), ফরাসি ভাষা ছাড়াও আরও কয়েকটি ভাষা জানতেন বলে বিভিন্ন গবেষক তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন।[১১] বলা হয়ে থাকে যে তিনি হিব্রু, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষাও জানতেন। এ ভাষাগুলোতে তাঁর কোন রচনা নেই। ফলে ভাষাগুলোতে তাঁর পারদর্শিতা সন্দেহাতীত নয়। তবে বিভিন্ন গবেষক হিব্রু ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।[১২] খ্রিস্টীয় ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হবার জন্যে, বিশেষ করে মূল বাইবেলের পুরোন অংশ পাঠের জন্যে তিনি হিব্রু শিখেছিলেন। বিলেত যাত্রাকালে জাহাজে রামমোহনের একজন সহযাত্রী লিখেছেন—"অধিকাংশ সময়েই তিনি সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠ করতেন মধ্যাহ্নের পূর্বে . . ."।[১৩]

রামমোহন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন বলে জনশ্রুতি থাকলেও তিনি কোথায় এবং কখন এ ভাষা দুটো শিখেছেন তার পক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁর 'বাঙালার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে রামমোহন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাসহ মোট দশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।[১৪]

বাংলা এবং হিন্দুস্থানি ভাষা ছাড়া তিনি ভারতের প্রাদেশিক কোন কোন ভাষায়ও দক্ষতা রাখতেন বলে ধারণা করা যেতে পারে। নগেন্দ্রনাথের ভাষায় :

"তাঁহার বয়স তখন প্রায় ষোড়শ বৎসর। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণকালে তত্রত্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য, পরিণত বয়সে, অনেক সময় তাঁহাকে নানক, কবির, দাদু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত।" [পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা ১৯৯৬ : ১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাক্ষিণাত্য হতে জনৈক ব্যক্তি নিজের প্রাদেশিক ভাষায় রামমোহনকে একটি পত্র লিখেছিলেন। ভাষাটি না জানার কারণে তিনি সে ভাষা জানা একজন ব্যক্তির মাধ্যমে পত্রটির বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন। অতঃপর ভাষাটি শেখার আগ্রহ হবার কারণে সেই ব্যক্তির কাছে তিনি তিন মাসের পরিশ্রমে ভাষাটি শিখেছিলেন।[১৫]

সিভিলিয়ানদের অল্প বয়সে ভারতে প্রেরণ করবার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রদানের এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন :

প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষা সকল শিক্ষা করিলে আধুনিক ও প্রচলিত ভাষা শিক্ষার অন্য প্রকার ব্যবস্থার জ্ঞান লাভ করা সুবিধা হয়।"[১৬] রামমোহন তাঁর নিজের জীবনেও এ ব্রত ধারণ করেছিলেন। সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষার পাশাপাশি তিনি ইংরেজি, ফরাসি, ফারসি প্রভৃতি আধুনিক ভাষায়ও নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। সে যুগের প্রায় মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাসহ প্রচলিত-অপ্রচলিত, আধুনিক-প্রাচীন এতগুলো ভাষা জানা অসম্ভবপ্রায় হলেও তাঁর অত্যুগ্র জ্ঞানতৃষ্ণা ও নিষ্ঠা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল।

তিন— রামমোহনের ভাষা-ভাবনা

রাজা রামমোহন রায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ এবং পত্রাবলীত তাঁর ভাষা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল আলোচনা ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষকের মূল্যায়ন ও সমকালীন প্রেক্ষাপটেই রামমোহনের ভাষা-ভাবনা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি। ভাষা-পরিকল্পনার অবস্থান এবং অবয়ব—দু'ধরনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামতকে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সচেতন ভাষা-ভাবনার প্রথম স্ফুরণ ঘটে তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থেই। সর্বসত্য প্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায় হল গ্রন্থ প্রকাশ এবং এ লক্ষ্য-তাড়িত

হয়েই তিনি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ফেরিস এন্ড কোং-র প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় বেদান্ত গ্রন্থ (১৭+১৬৫পৃঃ) বা বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন। রামমোহনের প্রথম মুদ্রিত এ গ্রন্থের তিনটি ভাগ—ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। অনুষ্ঠান ভাগের সূচনায় তিনি বাংলা গদ্য লিখনের কতিপয় নিয়ম উল্লেখ করেছেন। তার পরই তিনি পাঠকদের কাছে বাংলা ভাষায় 'বেদান্ত গ্রন্থ' লিখবার কৈফিয়ৎ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> "কেহো ২ এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয় তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বোঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর-আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না যদি এই রূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ১০]

বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচলিত ভাষা অর্থাৎ বাংলায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হলে তৎকালীন আচার-সর্বস্ব সংকীর্ণচেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এ উদ্যোগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে হিন্দু ধর্মসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করাতে ও শুনাতে পাপ হতে পারে না। ইতঃপূর্বে ধর্মীয় পুস্তকাদি সংস্কৃত ভাষাতেই আবদ্ধ ছিল। সে জন্যেই সংস্কৃত ভাষাদক্ষ কোন অতিশয় পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কেউই এ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে সমর্থ ছিলেন না। সকল শাস্ত্র যাতে সকল ভাষার লোক পড়তে বুঝতে পারে সে জন্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষার কঠিন প্রাচীর মুক্ত করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রচলিত ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা করে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকল গোত্রের কাছে তা উন্মুক্ত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—সৃষ্টিকর্তা মুক্তির তোরণ জীবমাত্রের জন্যেই উন্মুক্ত রেখেছেন— এতো শুধু পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমায়িত নয়। মার্টিন লুথার যেমন আধুনিক জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে প্রচলিত ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা ও ব্যাখ্যা করে খ্রিস্টীয় ধর্মের সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, রামমোহনও তেমনি প্রচলিত বাংলা ও অপরাপর ভাষার মাধ্যমে ধর্মসংস্কারের সাক্ষর রেখেছেন। এ শুধু ধর্মসংস্কারেই নয়; উপনিষদাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করে তিনি বাঙালি হিন্দু সমাজকে এক অভিনব চিন্তাপ্রবাহে উজ্জীবিত করেছেন।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রামমোহন রায়ের 'প্রার্থনাপত্র' প্রকাশিত হয়। এ প্রার্থনাপত্রেও তিনি প্রচলিত ভাষায় শাস্ত্রচর্চার পক্ষে উদাহরণ সহযোগে ক্ষুরধার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। পাছে কারো এমন ধারণা হয় যে, প্রচলিত ভাষায় উপাসনা করা হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, সেজন্যে তিনি গুরু নানক সম্প্রদায়, দাদুপন্থী, কবিরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতির উদাহরণযোগে প্রচলিত ভাষায় উপদেশ ও সঙ্গীতাদির মাধ্যমেও ব্রহ্মসাধনে কৃতকার্যতা লাভ সম্ভব বলে সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন। রামমোহনের ভাষায় :

"দশনামা সন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবের আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে "ঋগ্গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি॥" অর্থাৎ "ঋক্সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়, মোক্ষসাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্তধৃত শিবধর্ম্মের বচন "সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশ ভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—৪, ১৯৫০ : ২৭-২৮]

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচন্দ্রের চরিত্রকে সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে প্রচলিত মানবভাষায় রূপান্তরিত করবার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করে এর জন্যে রৌরব নরকপ্রাপ্তির মত কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবংনরকং ব্রজেৎ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রামায়ণ এবং মহাভারত অনুবাদ করবার কারণে যথাক্রমে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে 'সর্বনেশে' আখ্যায়িত করা হয়েছিল :

কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে,
—এই তিন সর্বনেশে।[১৭]

একই ধরনের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায় রামমোহনের বিরুদ্ধেও। তিনি সংস্কৃত ভাষার বদলে প্রচলিত ভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচার এবং ইংরেজি শিক্ষার উদ্যোগী ছিলেন বলে তাঁর নামে ছড়া চলিত হয় :

সুরাই মেলের কূল,
বেটার বাড়ি খানাকুল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।[১৮]

রামমোহন রায় যে শুধু বেদান্তচর্চা প্রবর্তন করেছিলেন তা-ই নয়, তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম পঞ্চোপনিষদ বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বঙ্গবাসীর প্রত্যক্ষ গোচরীভূত করেন। সংস্কৃত ভাষাবদ্ধ শাস্ত্রসমূহকে তিনিই প্রথম শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে সাধারণ্যে অবমুক্ত করেছেন। অধিকন্তু, তিনি বেদ শিক্ষার জন্যে ১৮২৬ সালে মানিকতলা স্ট্রীটের ৭৪ নম্বর গৃহে একটি বেদ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অ্যাডাম সাহেব ১৮২৬ সালের ২৭ জুলাই তারিখে লিখেছেন :

> "অল্পদিন হইল, রামমোহন রায় একটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন, বেদ-বিদ্যালয়। এক্ষণে উহাতে অল্পসংখ্যক কয়েকজন যুবা, একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিতেছেন। হিন্দু একেশ্বরবাদ সমর্থন ও তাহার প্রচার এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা আছে, এই বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালা কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় খ্রিস্টীয় একেশ্বরবাদ বিষয়ে শিক্ষা দিতেও তাঁহার ইচ্ছা আছে।" [নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২১১]

ধর্মসংস্কারে এভাবেই তিনি পালন করে গেছেন অগ্রণীর ভূমিকা।

পরাধীন ভারতে বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন রায়। রামমোহন সমকালীন বাস্তবতা সচেতন ছিলেন বলেই একজন পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও তিনি ইংরেজি ভাষা প্রচলনে তাঁর সর্বসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এই মতে যে— ভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শনের সাথে সম্যক পরিচিতি লাভ সম্ভব। এ জন্যেই তিনি ইউরোপীয় সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা ইংরেজির প্রচলনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তবে, এ দেশে ইংরেজি প্রচলনের একটি পটভূমি আছে যা প্রসঙ্গত আলোচনার দাবি রাখে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে আগমনে পূর্বে এ দেশের রাজভাষা ছিল ফারসি। কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনে এ দেশীয় অল্প কিছু লোক ব্যক্তিগত নিষ্ঠায় ইংরেজি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। কোম্পানির শাসন

প্রতিষ্ঠার ফলে এ প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। ধর্মপ্রচারের স্বার্থেও খ্রিস্টান মিশনারীরা বাংলা শেখেন এবং বাঙালিদের ইংরেজি শেখানোর প্রচেষ্টা নেন। ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হলে ইংরেজি চর্চার ব্যাপক গুরুত্ব অর্জিত হয়। রামমোহনের কালে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হল— হুগলিতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন (১৭৭৮), প্রথম ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ (১৭৮০), কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা (১৭৮১), সম্ভবত সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৭৯২), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০), আত্মীয় সভা (১৮১৫), হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইট (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), বাংলা পত্রিকা প্রকাশ (১৮১৮), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮) ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদ্যোগগুলো যে উল্লেখযোগ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে এর পাশাপাশি আরও কিছু উদ্যোগও লক্ষণীয়। ১৮০০ সাল অথবা তার কাছাকাছি কোন সময়ে কলিকাতার ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি এবং মধ্য কলিকাতায় ড্রামন্ড সাহেব একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাশাপাশি সম্ভবত এ দুটোই প্রথম।

বাংলা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে 'হিন্দু কলেজ', 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি'—এ তিনের রয়েছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।[১৯] বাংলা অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নবজাগরণে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে হিন্দু কলেজের ছিল তৎকালে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা। এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল :

> "The tution of the sons of respectable Hindus in English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia." [সুখময় সেনগুপ্ত ১৯৮৫ : ৩]

অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং একই সাথে ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহন একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অন্য দু'জন ছিলেন ডেভিড হেয়ার এবং স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট নামীয় ইংরেজ।

শিক্ষানীতি, ভাষা-মাধ্যম প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সে সময় কলিকাতায় শিক্ষা আন্দোলন দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে ভাষা মাধ্যমের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছিল সর্বাধিক :

> "এই প্রশ্নে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন মেকলে, বেন্টিঙ্ক, রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত, ভবানীচরণ, প্রমুখ এবং খৃষ্টান

মিশনারীরা। হেস্টিংস, জোনাথান, কোলব্রুক, মিন্টো, উইলসন, প্রিন্সেপ প্রমুখ ইউরোপীয় রাজকর্মচারী সংস্কৃত ও আরবি ভাষার সপক্ষে ছিলেন। মনরো, এলফিনস্টোন কেরি, মার্শম্যান, অ্যাডাম প্রমুখ তৃতীয় দল মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য-শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দু'টি দলের তুলনায় তৃতীয় দলটি দূর্বল হওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষা-বিস্তারের দাবি উপেক্ষিত হল।" [কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ১৯৮৫ : ৫৯-৬০]

রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখের 'আত্মীয়সভা' এবং রাধাকান্ত-ভবানীচরণের 'ধর্মসভা'-র সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তারাই রামমোহনের নেতৃত্বে ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। দেশীয় বণিক জমিদারদেরও একাংশ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা না দেশীয় শিক্ষা—এ বিতর্ক চলেছিল কমপক্ষে বারো বছর এবং ১৮৩৫ সালে ৭ মে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে ঘোষণার মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে প্রথমে রামমোহন সদস্য থাকলেও পৌত্তলিক হিন্দু ব্যক্তিবর্গ আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কালেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নহি।"[২০]

১৮১৭ সালের ১ জানুয়ারি ২০ জন ছাত্র নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু। এ প্রতিষ্ঠানের স্কুল এবং কলেজ দু'বিভাগেই ইংরেজি পাঠ্য ছিল। সেই সাথে স্কুল বিভাগে বাংলা, ব্যাকরণ, গণিত এবং কলেজ বিভাগে বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল। এই হিন্দু কলেজটিই পরবর্তীকালে ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং এ কলেজের পথ ধরেই একে একে আরো কয়েকটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[২১]

রামমোহন কেবল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়ই অবদান রাখেন তাই নয়; তিনি হিন্দু ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্যে ১৮২২ সালে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে হেদুয়া পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। অ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত এ স্কুলটির প্রায় সমস্ত ব্যয়ও তিনি একাই নির্বাহ করতেন। উইলিয়াম অ্যাডাম সাহেব ১৮২৮ সাল পর্যন্ত এ স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন এবং রামমোহন নিজে গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে এ স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ১৮৩০ সালে খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ডাফ সাহেব যে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন— এ ক্ষেত্রেও রামমোহনের যথেষ্ট উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছিল। যতদিন

পর্যন্ত এ স্কুলের নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা হয়নি, ততদিন পর্যন্ত রামমোহন স্কুলের জন্যে ব্রাহ্মসমাজের গৃহটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ স্কুলটিই পরবর্তীকালে 'জেনারেল এসেমব্লীজ ইনস্‌টিটিউশন' নামে খ্যাত হয়। স্কুলের প্রথম দিককার কিছু ছাত্র তিনিই যোগাড় করে দিয়েছেন। চল্লিশ টাকায় স্কুলের জন্যে বাসা ভাড়া করে দিয়েছেন এবং প্রায় মাসেক কাল তিনি প্রত্যহ স্কুলে গিয়ে তার তত্ত্বাবধান করেছেন। এর সব কিছুই ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের প্রতি তাঁর আন্তরিকতারই স্বাক্ষর বহন করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৃতীয়বার সনদ পরিবর্তনের সময় ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত সরকারকে জানায় যে :

> "That a sum of not less than a lakh of rupees in each year shall be set apart, and applied to the revival and improvement of literature, and the encouragement and promotion of a knowledge of the sciences among the British territories of India." [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৭৯ : ১০১]

সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নকল্পে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্যে ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে বরাদ্দকৃত এই এক লক্ষ টাকা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকে। ১৮২৩ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠিত হলে শিক্ষার জন্যে বরাদ্দকৃত এ অর্থ এবং শিক্ষা পরিকল্পনার দায়িত্ব এ কমিটির কাছে অর্পণ করা হয়। জেনারেল কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারে নদীয়া ও কলিকাতায় ১৮২৪ সালে এ অর্থব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ১১ ডিসেম্বর, ১৮২৩ তারিখে রামমোহন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে বহুল আলোচিত পত্রখানা লিখেন তাতে তাঁর ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন— যেহেতু ইংরেজরা হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা এদেশের জনসাধারণের ভাষা, সাহিত্য, জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণার সাথে পরিচিত নয়। রামমোহনের ভাষায় :

> "The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances as the natives of the country are themselves."

তিনি জানালেন— যে শিক্ষা বর্তমানে দেশে প্রচলিত আছে তা-ই আবার নতুন করে সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবস্থাই লর্ড বেকনের আগে ইউরোপে প্রচলিত ছিল। এ শিক্ষা যুবকদের মধ্যে শুধু ব্যাকরণ-পাণ্ডিত্যই নিয়ে আসবে; সমাজের ব্যবহারিক কোন কাজেই তা আসবে না :

> "We find that the government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This Seminary similar in character to those which existed in Europe before the time of lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society."

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা যে কতখানি দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ—একজন শিক্ষার্থীর প্রায় পুরো জীবনই এতে ব্যয়িত হয়। দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য এ জ্ঞান কিন্তু ফললাভে আশাপ্রদ কিছু নয় :

> "The Sanskrit language so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition ... and the learning concealed under this almost impervious veil, is far from sufficient to reward the labour of acquiring it."

সংস্কৃত শিক্ষাদান যদি সত্যই লক্ষ্য হয়, তবে তা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নয়, অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে :

> "... if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of valuable information it contains, this might much more easily accomplished, by other menus than the establishment of a new Sanskrit college."

গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এবং যুবকদের সংস্কৃত ব্যাকরণপণ্ডিত বানানোর জন্যে বারো বছর নষ্ট করে দেয়া ছাড়া আর অন্য কিছু হবে না :

> "... if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed since no improvement can be

expected form inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Baikarana or Sanskrit Grammar."

যদি ব্রিটিশদেরকে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা না দিয়ে অজ্ঞ রাখার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে বেকনীয় দর্শন তাদের অবহিত না করালেই হত। কারণ প্রাচীন জ্ঞানই তাদের অজ্ঞ রাখার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সেরূপ, এ দেশীয়দেরকে মূর্খ করে রাখাই যদি সরকারের নীতি হয়, তবে সংস্কৃতের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছুই হতে পারে না :

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature."

কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হল এ দেশীয়দের উন্নয়ন, সে জন্যেই তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, শরীরবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক যুগোপযোগী বিদ্যার প্রসার কামনা করেছেন দৃঢ়ভাবে। বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইংরেজি ভারতকে অবশিষ্ট পৃথিবীর সাথে যুক্ত করবে এটাই ছিল তার প্রত্যাশা :

"... as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with outher useful Sciences..."

এত প্রবল প্রতিবাদ ও বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তি সত্ত্বেও তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করে ১৮২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য এরই মধ্যে ১৮২৪ সালেই কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি ক্লাস শুরু হয়েছিল। স্কৃত কলেজেও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল— সেটা ১৮২৭ সালে।

লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা এ পত্রে রামমোহন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কথা বলেননি, বলেছেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপযোগিতার কথা। এমনই এক আধুনিক ভারতের স্বপ্ন তিনি আজীবন লালন করেছেন অসম্ভব নিষ্ঠার

সাথে। লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারের সিদ্ধান্তে তারই সূচনা হয় ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ তারিখে। এ দিনেই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সরকারি নীতি বলে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত, রামমোহন সংস্কৃত ভাষাচর্চা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, বিদ্যাসাগর তার সাথে একমত নন। বিদ্যাসাগর প্রবল অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাথে সংস্কৃত চর্চাকে সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন।

১৮৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালী বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি কমিটি গঠন করে। সিভিলিয়ানদের অল্প বয়সে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা উচিত কি না এ প্রশ্নে রামমোহন চব্বিশ বছরের পূর্বে তাদের প্রেরণের বিরোধিতা করেছেন। মতামত দিতে গিয়ে তাঁর ভাষা ভাবনার প্রকাশ ঘটে। আগত ধর্মপ্রচারকদের উদাহরণ টেনে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেছেন:

> "অল্প বয়সে সিবিলিয়নদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইবার পক্ষে এই একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাঁহারা অল্প বয়সে তথায় গমন করিলে দেশীয় ভাষা সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অতি অসার কথা। যে সকল মিসনরী খ্রীস্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হন, তাঁহাদের বয়স ২৫ হইতে ৩৫-এর মধ্যে। তাঁহারা তথায় গিয়া দুই কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যে দেশীয় ভাষা এমন উত্তমরূপে শিক্ষা করেন যে, দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন, এবং দেশীয় শ্রোতাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া দেশীয় ভাষায় অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন। যখন মিশনরীরা অধিক বয়সে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তখন সিবিলিয়নেরা পারিবেন না কেন? অল্প বয়সে হউক, বা পরিণত বয়সেই হউক, সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিলেই সহজে ভাষা শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ দেশীয় আসেসর, দেশীয় জুরি এবং অন্যান্য উপায়ে সাহায্য পাইলে, এবং পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ আদালতে ইংরেজি ভাষা চলিত হইলে, দেশীয় ভাষার জ্ঞান এখনকার ন্যায় এত অধিক প্রয়োজন হইবে না।" [নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২৪৮]

ইউরোপীয়রা এ দেশীয়দের ভাষা ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনবহিত বলে তখন অনেক সময়ই বিচার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কষ্টকর হয়ে পড়ত। এরূপ অবস্থায় এ দেশীয় একজন বিচারক নিয়োগ করা হলে তিনি ইউরোপীয় বিচারকের পাশে বসে সুষ্ঠু বিচার পরিচালনায় তাঁকে সহায়তা করতে পারেন বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন :

> "ইউরোপীয়েরা দেশের ভাষা আচার ব্যবহার, প্রথা অভ্যাস অনুষ্ঠান বিষয়ে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে। এক

একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান দেশীয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বিচারকরূপে বসিয়া কার্য্য করিলে, বিচার কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।" [নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২৪৯]

উল্লেখ্য, সে সময়ে এ দেশীয়রা কালেক্টর বা জজের দেওয়ানের ওপর কোন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারত না।

রামমোহন রায় ফারসির পরিবর্তে আদালতে ইংরেজি প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। সিভিলিয়ানদের ভারতবর্ষে প্রেরণ বিষয়ক মতামতেও তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিলেত বসবাসকালে তাঁর এ মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। খোদ বিলেতে বসেই তিনি 'The English in India should adopt Bengali as their mother tongue' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন :

"Are not the English in India few in number? Do not they boast how superior they are to us in everything, above all in freedom from prejudice : surely it is much easier for two or three thousand of them to adopt our language or character than to expect sixty millions of natives, most of whom are so poor that they work hard all day at their respective avocations, to give up that which they have used for centuries and accept a new one." [Rummohun Roy 1928 : 636]

সর্বভারতের জন্যে একটি সাধারণ ভাষাচিন্তা দ্বারাও রামমোহন তাড়িত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা তাঁকে আক্রান্ত করতে পারেনি বলেই তিনি একজন বাঙালি হয়েও হিন্দি ভাষার সমর্থন করেছেন।[২২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলায় বেদান্ত সূত্র প্রকাশের পূর্বেই তিনি হিন্দিতে বেদান্ত ভাষ্যের অনুবাদ করেছিলেন।

৪ ডিসেম্বর, ১৮২১ সালে তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন বাংলা সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী'। অথচ পত্রিকার মূল ব্যক্তি ছিলেন রামমোহন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন :

"নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন, 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পাদন ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথেষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।" [পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা ১৯৯৬ : ১৪৭]

'সম্বাদ কৌমুদী'র কোন সংখ্যা বর্তমানে পাওয়া না গেলেও ১৮২১ সালের প্রথমাবধি ৮ সংখ্যায় কী কী প্রধান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের ত্রয়োদশ খণ্ডের মাধ্যমে তা জানা যায়।[২৩] তার ষষ্ঠ সংখ্যায় 'পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দু বালকের ইংরেজী ও বাঙ্গালায় পারদর্শিতা' এবং সপ্তম সংখ্যায় 'ইংরেজী পাঠের পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক' শীর্ষক দুটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যদিও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ পত্রিকার লেখক ছিলেন, তবুও ধারণা করা যেতে পারে— এ প্রবন্ধ লেখায় রামমোহনেরও হাত থাকা অমূলক নয়। ১২ এপ্রিল, ১৮২২ সালে রামমোহন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ফারসি সাপ্তাহিক 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার'। এ পত্রিকারও কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে যতদূর জানা যায়— এ পত্রিকাতে 'বাংলা ব্যাকরণ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪] এর সবকিছুই ভাষা প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের আগ্রহকেই নির্দেশ করে।

চার— বাংলা গদ্য ও রামমোহন রায়

অষ্টাদশ শতকের শেষাংশে রাজা রামমোহন রায় যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা চলছে। সাহিত্য তখন কবিতা নির্ভর, ময়দানে কবিওয়ালাদেরই একছত্র বিচরণ। কবিকঙ্কন চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতিই তখন সম্বল। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যগ্রন্থের সূচনা। ১৯০১ সালে গদ্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' এবং রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। মূলত বাইবেল প্রচারের জন্যে কেরীর এবং ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শেখাবার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের বাংলা গ্রন্থ লেখা। ১৮০১ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যেই কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি প্রমুখের বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ কলেজের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় রচিত ও প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থই হল রাজা রামমোহন রায়ের অনুদিত 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। ১৮১৫-১৮৩০ কালপর্বে রামমোহন বেশ কিছু বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা গদ্য সৃজনে রামমোহনের অবদান বিষয়ে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায় দীর্ঘকাল ধরেই। তাঁর অনুবর্তীদের ভাষ্য—রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্যের প্রবর্তক এবং পথিকৃৎ। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ মত বহুল প্রচারিত এবং সাধারণ ধারণা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সমালোচকদের অনেকেই এ মতের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এ বিতর্কের নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

রামমোহনের জন্মের পূর্বেই বাংলায় লেখা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠি-পত্রের প্রচলন ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষ্য মতে আমরা জানতে পারি যে তাঁর গৃহে 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' নামে বাংলা গদ্যে হস্তলিখিত স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক একটি গ্রন্থ ছিল যেটিকে তিনি একশো বছরেরও আগের লেখা বলে ধারণা করেছেন।[২৫] তাছাড়া রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পণ্ডিতদের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে কোনভাবেই রামমোহনকে বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তক—এমনটি বলা যায় না। তাহলে রামমোহনের বিশেষত্ব কোথায়? বিশেষত্ব এইখানে যে— তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যরীতিকে সর্বসাধারণ্যে উন্মোচিত করেছেন। গদ্যগ্রন্থ না থাকায় তা পাঠের অভ্যাসও সাধারণ লোকের স্বভাবতই ছিল না। একথাও সত্য যে রামমোহন ছাড়াও আরো অনেকেই পাঠ্যগ্রন্থের বাইরে গ্রন্থ রচনা করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তাঁদেরই একজন। তবে সবই রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের পরে। রামমোহনের বাংলা গ্রন্থতালিকা মুখ্যত অনুবাদ, বিতর্ক-বিচার এবং ভাষ্য—এ তিন শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। তাঁর বিতর্ক-বিচারমূলক লেখাগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই স্বল্পপরিসর কিন্তু প্রচারধর্মী। তিনি নিজের মতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিযুক্তিতে প্ররোচিত করেছেন। এভাবেই ক্রমশ গদ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, সর্বসাধারণ্যেও তা আগ্রহের সঞ্চার করে। সাধারণ মানুষকে তিনিই প্রথম গদ্য পাঠে উজ্জীবিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু গদ্যের কোন শক্তিশালী আদর্শরূপ (model) না থাকায় গ্রন্থের আরম্ভেই তিনি গদ্যের তৎকালীন সীমাবদ্ধতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন :

> "প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনা আইসে না . . ." [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৯]

বাংলা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা নয়, এর যে একটি স্বাধীন সত্তা আছে—তা তিনি নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করেছিলেন। এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পূর্বসূরী লেখকদের মত "আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ" মধ্যে তাঁর রচনা রীতিকে সংকুচিত রাখেননি। পূর্বসূরীদের রচনার উল্লেখ থেকে এ মন্তব্য পরিস্ফুট করা যেতে পারে :

দৃষ্টান্ত-১ : উইলিয়াম কেরীর কথোপকথন, ১৮০১

> "হালো ঝি জামাইখাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস।

তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডাখাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাডে।"

দৃষ্টান্ত-২ : রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১

"হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল; আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত হইল; দিল্লির কর ও শওগাত এক কালিন বন্দি করিয়া আপন অধিকার তিন সুবা উৎপন্নীয় ধন দিয়া সৈন্য প্রচুর রাখিয়া খানজাতে মুরচাবন্দি করিল; হুকুম হইলে কর্জদাম করিয়া গোলাম এ টাকা খালিসা দাখিল করে।"

দৃষ্টান্ত-৩ : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, ১৮০৫

"পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান ২ পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক ২ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তমস্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্যসামগ্রীও দেহ যেন কোন মতে ব্যামোহ না পান। পাত্র রাজাজ্ঞামতে যাবতীয় পণ্ডিতের দিগকে আহবান করিলেন পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যমানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া রাজসভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।"

দৃষ্টান্ত-৪ : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বেদান্ত চন্দ্রিকা, ১৮১৭

"হে বিশিষ্টসন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুন। সকলে স্ব স্ব দৃষ্টান্তে অনুভব কর ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত জীববর্গের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখপরীহারে ও সুখপ্রাপ্তিতে মনোভিনিবেশ আছে। অতএব প্রজাবর্গের দুঃখপরীহার সুখপ্রাপ্ত্যর্থে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্বরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়সম্পাদক বেদ ও আন্বীক্ষিকী ও রাজনীতি ও বার্ত্তারূপ বিদ্যাচতুষ্টয় স্বসৃষ্ট প্রজাবর্গহিতৈষী পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ওপরের দৃষ্টান্ত চারটি থেকে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায় যে বাংলা গদ্য এ পর্যায়ে নির্মিতির স্তরে রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কতিপয় শব্দের পৌনঃপুনিক আবর্তনের মাধ্যমেই এর অবয়ব। এ পর্যায়ে বাংলা গদ্যে আতিশয্যের প্রধান দুটো উৎসও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি রাষ্ট্রভাষা ফারসি এবং দ্বিতীয়টি সংস্কৃত। ফলে রামরাম বসু যখন যথেচ্ছা ফারসি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাকে পরিপুষ্ট করতে চেয়েছেন তখন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে তাকে গতিশীল করতে সচেষ্ট থেকেছেন।[২৬] তারপরও অপেক্ষাকৃত যত সহজে সংস্কৃত শব্দ বাংলা গদ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে, ফারসি ততটা নয়; একে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে আরোপিত। অন্যদিকে কেরীর রচনায় আঞ্চলিক শব্দের (regional dialect) বাহুল্য এর সাহিত্যিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে প্রবলভাবে। রামমোহন ফারসি, সংস্কৃত এবং আঞ্চলিক শব্দের এই তিন থেকে

নিজেকে রক্ষা করেছেন এবং বাংলা গদ্যের সরল কিন্তু সাবলীল এক স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন অসম্ভব মনোযোগ ও দূরদর্শিতার সাথে। এখানেই রামমোহনের কৃতিত্ব।

বেদান্ত গ্রন্থ রচনাকালে বাংলা আদর্শরূপ না থাকাতে পাঠককুল বিশেষত সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে তিনি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতার জন্যে মার্জনা চেয়েছেন। সংস্কৃত ও স্বদেশীয় বাংলা ভাষাকে নিরীক্ষার মাধ্যমে সর্বজনবোধ্য করাবার জন্যে ভাষাকে সুলভ করতেও তিনি ত্রুটি করেননি। ভূমিকায় তিনি বলছেন :

"বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃত শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছ এহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জনা করিবেন . . ." [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৭]

অনুষ্ঠান অংশে তিনি বলছেন :

"এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৯]

বাংলা ভাষায় যে সাধু এবং চলিত রীতি প্রচলিত রয়েছে সে ইঙ্গিতই এ উক্তির মাধ্যমে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। সংস্কৃত-নির্ভর সাধুরীতি এবং 'সামান্য আলাপের ভাষা"— এ দু'য়ের কার্যকারিতা এবং শাস্ত্রগ্রন্থ রচনায় 'সামান্য আলাপের ভাষা'-র সীমাবদ্ধতাকে তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়—বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সচেতন ভাবনার বহিঃপ্রকাশও তাঁর এ বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

রামমোহনই প্রথম সাধারণ লোকদের কাছে বোধগম্য করবার জন্যে বাংলা বাক্য গঠনকৌশল নির্দেশ করেছেন :

"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে ২ যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না

পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না ..." [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৯]

বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে রামমোহন গদ্যরচনা করেছেন। গদ্যের পথ নির্দেশ করে তিনি নিজেই সে পথ পরিভ্রমণে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর গদ্য শিল্পীর গদ্য নয়; সুতরাং যথার্থ গদ্য শিল্পীর স্তুতিও তাঁর প্রাপ্য নয়। তারপরও তাঁর গদ্য পুনর্মূল্যায়িত হবার দাবি রাখে—এ জন্যে যে পরবর্তীকালের বহু কৃতি লেখকই তাঁর নির্মিত পথের শরণ নিয়েছেন; পথকে করেছেন প্রশস্ত।

বাক্য গঠনকৌশল এবং পদক্রমের আন্বয়িক সমন্বয় রামমোহনকে তাড়িত করেছিল। আর এজন্যেই পদক্রমের সুসমন্বয় তাঁর রচনাকে অনিয়ম মুক্ত রাখতে পেরেছিল। রামমোহন থেকে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

"সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না/যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয়/তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে/তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই॥" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৪৬]

"ইহার তাৎপর্য এই যে/বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই/তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না/আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয়/আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয়/সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—২, ১৯৫০ : ৪৬]

রামমোহনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ— তিনি খণ্ড বাক্যের পর খণ্ড বাক্য, সংযোজক অব্যয় জোড়া দিয়ে দিয়ে অনাবশ্যক দীর্ঘ এবং জটিল বাক্য সৃষ্টি করেছেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত এ বক্তব্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

". . . রামমোহনে আছে জটিল বাক্যের অনাবশ্যক বিস্তার ও নানা ভিন্ন জাতের অসংগত বাক্য যোজনার ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা ভিন্ন জাতের সংযোজক ব্যবহার করে তিনি বাক্যকে জটিল করেছেন।" [অরুণকুমার বসু ১৯৯২ : ৮১]

রামমোহনের নিজের ভাষ্য ছিল :

"এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না . . ." [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৯]

এ ধরনের বাক্যের অর্থ অনুধাবনের সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করলেও তিনি নিজেই সেটা পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা বাক্যের পদক্রমের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ক্রিয়াপদের অবস্থান সবার শেষে। ইংরেজিতে এর অবস্থান মাঝখানে। অর্থাৎ বাংলা বাক্য কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) এবং ইংরেজি বাক্য কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO) সূত্রবদ্ধ। রামমোহন ঐ যুগের অনেকের মত ইংরেজি পদবিন্যাস রীতির অনুসরণে বাংলা বাক্য গঠন করেননি। তিনি বাক্য শেষেই ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন :

"যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ২৩৩]

"সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ মহামন্ত্রের দাতা সংসারদুঃখহারক যে তুমি হে গুরু তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত প্রণাম করি।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—২, ১৯৫০ : ৮৯]

বাক্য সমাপ্তিতে বাংলায় 'হয়' ক্রিয়াপদ অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজিতে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সংযোজক হিসেবে 'is' আবশ্যিক। কিন্তু ইংরেজির নিয়ম বাংলায় প্রযোজ্য নয় বলে He is beautiful সে হয় সুন্দর/সে সুন্দর হয়—জাতীয় বাক্য ব্যবহার যোগ্য নয়। কিন্তু এ কর্মটি রামমোহনে লক্ষ্য করা যায় :

". . . যে পূর্ব্বশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের অধীন হয়।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৬৩]

"সংসারের বিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ হয় ইহা কেন না ওই বচনের তাৎপর্য্য হয়।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—৬, ১৯৫০ : ৯]

ক্রিয়াপদ ব্যবহারে রামমোহন অনেকখানি সনাতনপন্থী এবং ঐতিহ্য অনুসারী ছিলেন। ভবিষ্যৎ কালসূচক ক্রিয়াপদে অন্ত পর্যায়ে 'ক' এর অতিরিক্ত সংযুক্তি লক্ষণীয় :

"শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদিরূপ সাধন করিবেক এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৩৪]

"কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে সকল লোক ব্রহ্ম এই শব্দ কহিবেক কিন্তু হে মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণেরা অনুষ্ঠান করিবেক না।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—৬, ১৯৫০ : ১০৪]

মধ্য যুগের শেষ পর্বের বৈদিক পুঁথিতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসুসহ সে আমলের অনেকের লেখায়, এমনকি বিদ্যাসাগরেও 'ক'-অন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দৃশ্যমান।

সংযোজক অব্যয় হিসেবে রামমোহনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে 'আর' এবং 'ও'-এর ব্যবহার রয়েছে। বাইবেল, কোরআন এবং ইংরেজি ভাষায় এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ব্যাপক। ইংরেজি ভাষা ও এ সকল ধর্মগ্রন্থের গদ্যশৈলী তাঁকে সংযোজক

অব্যয়ের অতি ব্যবহারে প্ররোচিত করে থাকতে পারে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক:

"কেহো ২ এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয় তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেনা কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ১০]

চারবার 'এবং' ও চারবার 'আর' মোট আটবার সংযোজক অব্যয় ব্যবহারে রামমোহন ১২১ শব্দের এ দীর্ঘ বাক্যটি তৈরি করেছেন। রামমোহনে 'ও' এর ব্যবহারও নিতান্ত কম নয়। সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে বাক্য আরম্ভ করা তাঁর প্রিয় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি।

সংযোজক অন্বয়ের (co-relative) প্রয়োগ রামমোহনের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা-বৈশিষ্ট্য। যে-সে, যেহেতু-সেহেতু যেরূপ-সেরূপ, যদি-তবে, যাহারা-তাহারা, যখন-যাহা, যাবৎ-তাবৎ প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

"যেমন আকাশাদের উৎপত্তি সেইরূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—১, ১৯৫০ : ৬০]

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে জানে এবং তাঁহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়। [রামমোহন গ্রন্থাবলী—২, ১৯৫০ : ৪৭]

ধর্ম ও সমাজসংস্কারমূলক এবং বিতর্ক-বিচারমূলক লেখায় অধিকাংশ সময়ে প্রবৃত্ত থাকবার দরুন তাঁর রচনায় 'অতএব' 'সুতরাং' 'যেহেতু' 'সেহেতু'—এ জাতীয় সিদ্ধান্তবাচক শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি, বরং ভাষার যুক্তিনির্ভরতা বা 'লজিক' কে শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিভক্তি প্রয়োগে ষষ্ঠীতে 'র'-এর সঙ্গে '-দের'/'-দিগ' এবং সপ্তমীতে 'এ'-র বদলে '-এতে' লক্ষণীয়। এ দু'প্রয়োগেই তিনি সনাতনধর্মিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ষষ্ঠী—

আমারদের, তাঁহারদের, আমারদিগের, তাঁহারদিগের, যাঁহারদের প্রভৃতি।

সপ্তমী—

দেশেতে, পুরাণেতে, আকাশেতে প্রভৃতি। অনেকক্ষেত্রে তিনি সপ্তমীতে 'এ'-র ব্যবহারও করেছেন। যেমন— স্বর্গে, শাস্ত্রে, বিষয়ে প্রভৃতি।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ যেখানে অতিমাত্রায় সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন তখন রামমোহন সমাসবদ্ধ পদ ভেঙে ব্যাসবাক্যসহ লিখেছেন :

রামমোহনে ব্যবহৃত	রামমোহনে অব্যবহৃত
সন্ন্যাসের বিধি	সন্ন্যাসবিধি
উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত	উৎসাহভঙ্গ

ক্রিয়া সংযোজক বা verb copula-র ব্যবহার রামমোহনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখেছেন:

'বিবরণ করিয়া থাকেন', 'পাতক হয়', 'চেষ্টা করা যাইতেছে' প্রভৃতি।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় যতিচিহ্ন হিসেবে শুধুমাত্র এক এবং দুই দাঁড়ির প্রচলন ছিল। ইংরেজির অনুকরণে পরবর্তীকালে বাংলাতেও যতিচিহ্নের প্রয়োগ শুরু হয়। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকাতেই প্রথম নানা ধরনের যতিচিহ্নের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দিগ্‌দর্শনেই দাঁড়ির পাশাপাশি কমা, সেমিকোলন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে এই দিগ্‌দর্শনেই আবার দাঁড়ির বদলে ফুলস্টপেরও ব্যবহার দেখা যায়। রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' 'গোস্বামীর সহিত বিচার' প্রভৃতি রচনায় পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নি হিসেবে দাঁড়ি ছাড়া আর কোন যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু তাঁর ১৮১৯ সালে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' শীর্ষক রচনাতেই প্রথম কমা ও সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে উদ্ধৃতিচিহ্নও দৃষ্টিগোচর হয়। বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যে প্রথম কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির প্রচলন করেছেন—এ ধরনের বক্তব্য অসার বই কিছু নয়।

বাংলা ভাষা যে বাংলা ভাষাই—এ যে সংস্কৃত বা ইংরেজি নয়—তাঁর মত সংস্কৃত ও ইংরেজি পণ্ডিত এটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বাংলা ভাষার এ স্বাতন্ত্র্য তিনিই নির্দেশ করেছিলেন অসম্ভব ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে। যদিও এক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য তিনি দেখাতে পারেননি :

> "সর্বদা সেই চিন্তার প্রয়োগ তাঁর ভাষায় করতে পারেননি, কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; আর এখানেই বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে তাঁর মূল্য স্বীকার্য।" [নরেন্দু সেন ১৯৯০ : ৫১]

সমস্ত বিচারেই রামমোহনের বাংলা তাঁর ইংরেজি থেকে বহু বহু গুণ সৌষ্ঠবহীন। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলা গদ্য সূচনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। এ জন্যেই তাঁর রচনায় শব্দ পরিপাট্যের বড় অভাব। তাঁর প্রধান গুণ—বক্তব্যকে সরল করে উপস্থাপিত করবার জন্যেই তিনি লিখেছেন; শব্দ বা বাক্যের খেলা দেখাবার জন্যে নয়। তাই সে ভাষা নিতান্তই প্রাঞ্জল। ১৮৫৪ সালের ১৩ মার্চ প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলেছেন :

> "দেওয়ানজী[২৭] জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন . . .।" [পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা ১৯৯৬ : ৮৪]

শুধু তা-ই নয়, একই সংখ্যায় তিনি বলেছেন যে রামমোহনের গদ্যদৃষ্টে "অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।" [পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা ১৯৯৬ : ৮৭] বাংলা গদ্যরীতি ও শৈলী প্রকরণে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার প্রভাব ও উত্তরাধিকারেই দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখের উত্থান।

পাঁচ—রামমোহন রায় ও বাংলা ব্যাকরণ

রামমোহনই হলেন প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন। রামমোহনের পূর্বেও এক বা একাধিক ব্যক্তি বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন বলে যদিও সম্প্রতি মত প্রকাশিত হয়েছে, এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণসিদ্ধ নয়।[২৮]

রামমোহন রায় বাংলা ভাষার দুটো ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রথমটি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত *Bengalee Grammar in the English Language* এবং দ্বিতীয়টি ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। যদিও অনেকেই তাঁর বাংলা ব্যাকরণকে ইংরেজি ব্যাকরণের অনুবাদ হিসেবে উল্লেখ করেন, বস্তুত এ দু'য়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। অনুবাদ নয়, রামমোহন ইংরেজি ব্যাকরণকে অবলম্বন করে তাঁর বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন।

প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন, কোন লক্ষ্যতাড়িত হয়ে রামমোহন প্রথমে ইংরেজি ও পরে বাংলায় ব্যাকরণ রচনা করলেন। Grammar বইটির ভূমিকায় রামমোহন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে— ইউরোপীয় কিছু লোকহিতৈষী ভদ্রলোক (gentleman philanthropists) দেশীয় লোকদের সাথে কথাবার্তা বলতে ব্যাপক শ্রম (much labour) ব্যয় করেন। এ সমস্ত গুণী (worthy persons) এর জন্যেই তাঁর ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা। এতে করে দেশী-

বিদেশীদের যোগাযোগ (intercours) সহজ হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—বিদেশী ইংরেজদের প্রতি উপচিকীর্ষাই তাঁর Grammar রচনার অনুপ্রেরণা।

রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালের এপ্রিলে। তখন তিনি বিলেতে। তাঁর ইচ্ছানুসারে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক লিখিত একটি ভূমিকাসহ এটি মুদ্রিত হয়। ভূমিকায় বলা হয় :

> "সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে এক ২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যকরূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্য ২ ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলন্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টির সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক্ সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যত্ন পূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি।"

স্পষ্টই লক্ষণীয়—কেরী, হ্যালহেড এবং রামমোহনের ইংরেজি ভাষায় ব্যাকরণ লেখার উদ্দেশ্য ছিল যেখানে বিদেশীদের বাংলা শেখানো সেখানে রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয়দের বাংলা ভাষার নিয়মের সঙ্গে পরিচিত করে তাদের অন্যান্য ভাষা বিশেষ করে ইংরেজির জন্যে প্রস্তুত করা। রামমোহন নিজে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষা রপ্ত করেছিলেন নিপুণতার সঙ্গে। সুতরাং নতুন কোন ভাষা শিখতে যে ভাষার সূত্র জানা প্রয়োজন এবং সেটা যে নিজের ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল না থাকলে সম্ভব না—সে বোধ তাঁর ছিল। Grammar এবং ব্যাকরণ শেখার তাগিদ মূলত পারস্পরিক ভাষিক যোগাযোগের জন্যে। বিদেশীরা যখন Grammar শেখে তখন ভেতরে বাইরের আধিপত্য এবং দেশীয়রা যখন ব্যাকরণ শেখে তখন বাইরে ভেতরের আধিপত্য বিস্তারের মানস প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। এভাবেই তৈরি হয় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের সাংস্কৃতিক পটভূমি। রামমোহন যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন, তখন তিনি 'On the possibility, practicability and expediency of substituting of the Bengali Language for the English'[২৯]—নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধে তাঁর এ জাতীয় ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হলেও এটি লিখিত হয়েছিল ১৮৩০ এর আগে। 'সম্বাদ কৌমুদীর' ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় যথাক্রমে 'পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দু বালকদের ইংরেজী ও বাঙালায় পারদর্শিতা' এবং 'ইংরেজী পাঠের পূর্ব্বে বাঙালী বালকদের ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক "শীর্ষক যে দুটো আলোচনা প্রকাশিত হয়, যদি এমনও হয় যে তা রামমোহনের রচনা নয়, তবুও এ দু'য়ের বক্তব্যের প্রতি রামমোহনের সমর্থন ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ইংরেজি ভাষায় লেখা ব্যাকরণেরও পাঁচ বছর আগে। সুতরাং তাঁর ব্যাকরণ রচনা কোন আকস্মিক চিন্তার ফসল নয়। এ ভাবনা তাঁকে দীর্ঘকাল ভাবিয়েছে। ব্যাকরণ পাঠের আবশ্যকতা নির্দেশ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ইংরেজি ব্যাকরণটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় :

> "The conviction that a Bengali Grammar, better adopted to the instruction of native youths than the one on their list, has led your committee to solicit the services of Baboo Rammohun Roy in preparing one: they are happy to report, that this gentleman has cheerfully engaged to give his immediate attention to the execution to this work."[৩০]

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি শুধু এটি প্রকাশই করেনি, এর বিভিন্ন সংস্করণও বের করে। ১৮৫৬ পর্যন্ত এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখনকার বহু বিদ্যালয়ে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় এবং কয়েকটি কলেজে এ ব্যাকরণটি পাঠ্য ছিল। এ গ্রন্থটির এতগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে এবং এত এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য থাকাতে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে এরকম একটি গ্রন্থের জন্যে তৎকালীন শিক্ষার্থীসমাজ কতটা আগ্রহী ছিল। আর এ জন্যেই হ্যালহেড, কেরী, হটন এমনকি নিজের ইংরেজি ভাষায় লেখা ব্যাকরণ বর্তমান থাকতেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন এমন একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখতে। এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। রামমোহন শুধু বাংলাভাষার ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি ব্যাকরণকারই নন,[৩১] স্কুল/কলেজপাঠ্য ব্যাকরণগ্রন্থেরও তিনিই প্রথম রচয়িতা।

রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' আলোচনা করলেই তাঁর ব্যাকরণ-ভাবনাকে প্রকৃষ্টভাবে জানা সম্ভব। এর কারণ প্রধানত দুটো—

ক) যেহেতু তিনি ইংরেজি ব্যাকরণকে অবলম্বন করেই তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-টি রচনা করেছেন, সেহেতু দু'য়ের মধ্যে ভাষাগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

খ) দ্বিতীয়টি যেহেতু তাঁর প্রথমটির কয়েক বছর পর রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ফলে দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির ত্রুটি সংশোধন ও অনালোচিত বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে নতুন কিছু সংযোজনের সুযোগ ছিল।

আমরা তাই গৌড়ীয় ব্যাকরণ পর্যালোচনারই চেষ্টা করবো। তবে অত্র প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য যেহেতু শুধুমাত্র তাঁর ব্যাকরণ আলোচনা নয়, ফলে এখানে এ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনারও সুযোগ নেই।

রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ কাঠামোটি নিম্নরূপ—

প্রথম অধ্যায়	—	প্রকরণ সংখ্যা ৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	—	প্রকরণ সংখ্যা ৫
তৃতীয় অধ্যায়	—	পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩
চতুর্থ অধ্যায়	—	প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ আলোচিত; কোন প্রকরণ বা পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	—	বিশেষণ শব্দের বিভাগ প্রকরণ; গুণাত্মক বিশেষণ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	—	আখ্যাত প্রকরণ
সপ্তম পরিচ্ছেদ	—	ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ
অষ্টম পরিচ্ছেদ	—	বিশেষণীয় বিশেষণ
নবম পরিচ্ছেদ	—	সম্বন্ধীয় বিশেষণ
দশম পরিচ্ছেদ	—	সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ
একাদশ পরিচ্ছেদ	—	অন্তর্ভাব বিশেষণ
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	—	অন্বয় প্রকরণ

(মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭)

আজকের জ্ঞান নিয়ে গত কালের জ্ঞানের বিন্যাস পর্যালোচনায় বহু ত্রুটি এবং অসঙ্গতিই যে চোখে পড়বে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গ্রন্থ কাঠামোটি সযত্নপ্রয়াসসৃষ্ট নয়। প্রথম চারটি অধ্যায়ের পর আর কোন অধ্যায় নেই। বরঞ্চ সেখানে আমরা পাচ্ছি মোট আটটি পরিচ্ছেদ। আবার প্রথম দুটো অধ্যায়ের বিভাজনে মোট নটি প্রকরণ পেলেও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকরণের স্থলে তিনটি পরিচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকরণ বা পরিচ্ছেদের উপবিভাজন অনুপস্থিত। সেখানে একবারেই 'প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ' আলোচিত হয়েছে। বস্তুত, এগুলো গৌণ মূল্য বহন করে। অবশ্য আমরা এও জানি "তাঁহার

ইংলন্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই–"।

গৌড়ীয় ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের ১ প্রকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং ইংরেজি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও উদ্দিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায় :

গৌড়ীয় ব্যাকরণ :

> "সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপন করেন, সেই রূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনি হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।
>
> দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্দ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সংকেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ ২ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দ জ্ঞানদ্বারা সেই ২ শব্দের বিশেষ ২ অর্থ জ্ঞান হয়।"

ইংরেজি ব্যাকরণ :

> "Man expresses his thoughts principally by means of oral sounds বক্রধ্বনি, of these some are natural and bear the same signification amongst all nations: as the sounds of crying and laughing. Others are of conventional adoption: and of these last the inhabitants of various countries have each their own peculiar sounds for the expression of their ideas. Those conventional sounds form what is called language ভাষা and are frequently expressed by conventional marks called characters. অক্ষর।"

উভয় ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য একই। কিন্তু ইংরেজি গ্রন্থটি বয়স্ক শিক্ষার্থীদের (ইংরেজ সিভিলিয়ান) জন্যে রচিত বলেই ধ্বনি ও অক্ষরের মত প্রাথমিক আলোচনা সংক্ষিপ্ত; আর বাংলা গ্রন্থটি অল্পবয়স্ক বিদ্যালয়পাঠ্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত হবার কারণে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বিশদ। ব্যাকরণের মুখ্য আলোচনা যে মানুষের মুখের ভাষা এবং সে ভাষার স্থানগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমের জন্যেই যে লিপির উদ্ভব ঘটেছে— এ ধরনের আলোচনা তাঁর চিন্তা-শক্তির গভীরতার স্বাক্ষর বহন করে। অবশ্য শুধুমাত্র স্থানগত সীমাবদ্ধতাই নয়, কালগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্যেও লিপির প্রয়োজন।

ব্যাকরণের সূচনাতেই তিনি ভাষা, ব্যাকরণ, বর্ণ, পদ, বাক্য, কারক, পুরুষ প্রভৃতির প্রাথমিক পরিচিতি দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁর পুরো ব্যাকরণের কাঠামোটি তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধি প্রকরণের আলোচনায় তিনি বর্ণ প্রকরণকে হল (ব্যঞ্জন) এবং স্বর—এ দু'য়ে বিভক্ত করে সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন :

> "গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণ আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'পদবিধান' অংশে তিনি ভাষার তাবৎ পদকে বিশেষ্য ও বিশেষণ— এ দু'ভাগে বিভাজিত করে সেগুলোর উপ-বিভাজন নির্দেশ করেছেন। কাঠামোটি[৩২] অনেকটা এমন—

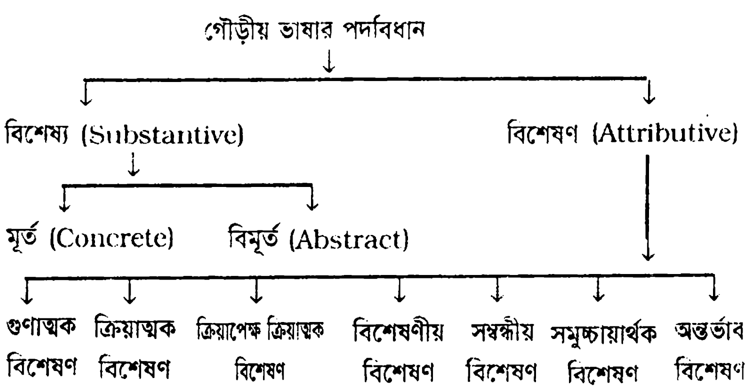

সকল প্রকার বিশেষ্য ও বিশেষণের উদাহরণ দিয়ে তিনি এ বিভাজন রেখাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উল্লেখ্য, পদ বিভাজনের এ নিয়ম ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পূরক নয়: ধ্রুপদী ইউরোপীয় ঐতিহ্য লালিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২ প্রকরণে 'নামের রূপবিষয়ে' শীর্ষক আলোচনায় 'কারক' প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। যদিও তিনি 'কারক' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন, তবে তা সংস্কৃত ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। case-এর বাংলা করতে গিয়ে তিনি 'পরিণমন' 'পরিণাম' এ দুটো অভিধাও ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের অভিধা ব্যবহার প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয় :

> "রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের 'কারক' এই পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি। . . . . বরং 'কারক' শব্দটি ইংরেজি case-এর অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি case শব্দটি এসেছে লাতীন *casus* থেকে (শব্দটি গ্রীক *ptosis*-এর লাতীন অনুবাদ), *casus*-এর মূল অর্থ ধ'রে রামমোহন case-এর বাঙলা প্রতিশব্দ ক'রেছেন 'পরিণমন'। এক্ষেত্রে রামমোহন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের পরিবর্তে প্রাচীন গ্রীক ব্যাকরণকারদের মত-ই অনুসরণ করেছেন। এই মতে, কর্তৃকারকে নামপদটির যেন 'খাড়া, উন্নত বা দণ্ডায়মান অবস্থান' (*Casus rectus*, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'খাড়া পতন'), এর পাশে অন্যান্য case বা কারকগুলি হচ্ছে oblique (অর্থাৎ 'তির্য্যক্') বা পতনের নিদর্শন। এই ব্যাখ্যা ধরেই রামমোহন ইংরেজি বইতে case-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছেন 'পরিণমন'; আর বাঙলা বইতে 'পরিণাম'।" [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৯০ : ৪]

বাংলা ভাষার পক্ষে সংস্কৃত রূপতত্ত্ব আদর্শ হতে পারে না। সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা বাংলা থেকে অনেক বেশী। বিভক্তি প্রয়োগের ধারণা থেকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাযুজ্যে বাংলা কারককে ছয় প্রকার হিসেবে চিহ্নিত করেননি। তাঁর মতে বাংলায় কারক চার প্রকার— অভিহিত পদ (কর্তৃপদ), কর্মপদ, সম্বন্ধপদ এবং অধিকরণ পদ। কর্ম এবং সম্প্রদানের রূপ বাংলায় অভিন্ন হওয়াতে বাংলায় সম্প্রদানকে আলাদা কারক হিসেবে নির্দেশ করেননি। রামমোহনের ভাষায় :

> "সংস্কৃতে দানক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, এ কারণ তাহার পৃথক প্রকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী—৭, ১৯৫০ : ১৪]

করণ এবং অপাদানের স্বকীয় বিশেষ রূপ না থাকাতে রামমোহন বাংলা ভাষাতে এ দু'য়ের 'পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক' দেখেননি।

প্রকরণ-৩ এ 'নামের বচনবিষয়ে' আলোচনায় রামমোহন দুটো বচন— একবচন এবং বহুবচন নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্কৃতে তিনটি বচন

থাকলেও বাংলায় এ সংখ্যা দুই। সামাজিক প্রসঙ্গভেদে বহুবচনের রূপগত ভিন্নতা সম্পর্কে তিনি বলেন :

"যখন গরু পশু ইত্যাদি শব্দ মূর্খতা জ্ঞাপনের নিমিত্তে মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহার রূপের অন্যথা হয়, যেমন গরুরা, পশুরা, গরুদিগকে জ্ঞান দেয়। আর বহুবচনাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ মনুষ্য জাতিতেও হইতে পারে, যেমন সকল মনুষ্য, মনুষ্য সকল। এ স্থলে ঐ জাতিবাচক শব্দের বহুবচনে রূপান্তর হয় না, একবচনের রূপ থাকে।" [রামমোহন গ্রন্থাবলী---৭, ১৯৫০ : ১৬]

তিনি কারকভেদে নামপদের একবচনে ও বহুবচনের রূপগত ভিন্নতা উদাহরণ সহযোগে নির্দেশ করেছেন। তুচ্ছতা নির্দেশে নামপদের রূপধ্বনিগত পরিবর্তন তিনি নিচের নিয়মে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—

রাম → রামা ;

হরি → হরে;

কাশী → কাশে, কেশে;

শম্ভু → শম্ভো;

রাধা → রেধো;

গনেশ → গণশা; ইত্যাদি।

প্রকরণ ৫-এ লিঙ্গ বিষয়ক আলোচনায়ও তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ভাষায় :

"যেমন অন্য ২ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের আকারের অন্যথা হইয়া থাকে সে রূপ বঙ্গ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের রূপান্তর প্রায় হয় না, ... সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়ম সকল তাহা বাঙ্গালা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে কি প্রতিসংজ্ঞায় কি বিশেষণ পদে লিঙ্গজ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, . . ." [রামমোহন গ্রন্থাবলী----৭, ১৯৫০ : ১৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ ব্যাকরণিক (grammatical) বলেই সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্যীকরণে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন না।

সমাসের আলোচনায়ও (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) তিনি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সঙ্গে উদাহরণ সহযোগে তুলনা করে তিনি বাংলা ভাষার চার ধরনের সমাস নির্দেশ করেছেন----

এক — অভিহিত + কর্ম = হাড়কাটা

দুই — অভিহিত + অভিহিত = তালপুকুরে

তিন — বিশেষণ + অভিহিত = মিষ্টমুখো

চার — একজাতীয় শব্দের মিলন = হাতাহাতী ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা 'প্রতিসংজ্ঞা' নিয়ে। স্পষ্টতই—এ পরিভাষা নির্মাণে তিনি ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণকে অনুসরণ করেছেন। Pro-noun— প্রতিসংজ্ঞা। এখানেও তিনি অভিহিত, কর্ম, অধিকরণ এবং সম্বন্ধ—এই চার প্রকার কারকভেদে প্রতিসংজ্ঞার (সর্বনাম) ভিন্নতা প্রদর্শ করেছেন—

অভিহিত	কর্ম	অধিকরণ	সম্বন্ধ
আমি	আমাকে	আমায়, আমাতে	আমার
আমরা	আমাদিগগে	আমাদিগেতে	আমাদের

তিনি পঞ্চম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিচ্ছেদে একে একে গুণাত্মক বিশেষণ, ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ এবং অন্তর্ভাব বিশেষণ আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'ক্রিয়াত্মক বিশেষণ' শিরোনামে তিনি ক্রিয়াপদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ দীর্ঘ আলোচনায় স্থান পেয়েছে ক্রিয়ার প্রকার, বিভক্তিবাচ্য কাল, ধাতুরূপ, নির্ধারণ প্রকাব, সংযোজন প্রকার, নিয়োজন প্রকার, অভাবার্থ, কর্ম্মণি বাচ্য, প্রশ্ন প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে অন্বয় প্রকরণ। এটাকেই বর্তমানকালে আমরা বলছি syntax বা বাক্য প্রকরণ। আলোচনার শুরুতেই তিনি বলছেন :

> "এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহ্য হউক কিম্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়া হয়, যেমন রাম যান।"
> [রামমোহন গ্রন্থাবলী - ৭, ১৯৫০ : ৬২]

বাক্যস্থিত পদের অন্বয় নির্দেশে তিনি স্পষ্টই ইংরেজি ব্যাকরণ দ্বারা চালিত হয়েছেন তা না হলে 'এক নাম ও এক ক্রিয়া'র কথা বলবেন কেন। ইংরেজিতে ক্রিয়াবিহীন বাক্য সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রকৃতি ভিন্ন। এ ভাষায় ক্রিয়াবিহীন বাক্য হতে কোন বাঁধা নেই। যেমন— ছেলেটি সুন্দর। 'এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত দুই শব্দের অন্বয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না' বলেও তিনি অসতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একশাব্দিক বাক্যও অসম্ভব নয়— যদি শব্দটি ক্রিয়া হয়। যেমন- নাচ, গাও। অন্বয় প্রকরণে তিনি বিভিন্ন ধরনের বাংলা অন্বয় রীতির আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন।

এ পরিচ্ছেদেরই শেষাংশে ছন্দঃ বিষয়ক আলোচনা লক্ষণীয়। কিন্তু এ আলোচনা নিতান্তই দায়সারাগোছের। কি সংগীত, কি কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দের দৈন্য তাঁকে ছন্দ আলোচনায় নিরুৎসাহিত করেছে :

"গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তম রূপে আছে, সুতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; ... ..." [রামমোহন গ্রন্থাবলী—৭, ১৯৫০ : ৬৬]

প্রসঙ্গত, রামমোহন 'পয়ার' 'দ্বিপদী' এবং 'তোটক'—এই তিন ছন্দ আলোচনা করেই ছন্দ আলোচনার ইতি টেনেছেন।

রামমোহন রায়ের ভাষা ও ব্যাকরণ ভাবনায় পরিভাষা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তিনি যেহেতু ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা নির্মাণ করতে হয়েছিল। প্রায় পৌনে দু'শো বছর পূর্বে রামমোহন যে সমস্ত পরিভাষা নির্মাণ করেছিলেন বর্তমানে সেগুলোর প্রচলন বিচারে তাঁর সাফল্যের মাত্রা পঞ্চাশ শতাংশ। তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষার দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

রামমোহনকৃত অপ্রচলিত পরিভাষা—

Oral Sound	—বক্তুধ্বনি	Pronoun	—প্রতিসংজ্ঞা
Etymology	—পদবিধান	Verb	—ক্রিয়াত্মক বিশেষ, আখ্যাতিক পদ
Proper name	—ব্যক্তিসংজ্ঞা	Imperative	—নিয়োজন প্রভৃতি।
Common name	—সামান্য সংজ্ঞা		

রামমোহনকৃত প্রচলিত পরিভাষা—

Language	—ভাষা,	Letters	—বর্ণ,
Character	—অক্ষর,	Sentence	—বাক্য,
Grammer	—ব্যাকরণ,	Consonant	—ব্যঞ্জন/হল,
Vowel	—স্বর,	Singular number	—একবচন,
Plural number	—বহুবচন,	Gender	—লিঙ্গ,
Compound name	—সমাস,	Transitive	—সকর্ম্মক,
Intransitive	—অকর্ম্মক,	Conjugation	—ধাতুরূপ,
Prosody	—ছন্দ।		

স্পষ্টতই, তিনি অনেক পরিভাষাই অবিকল সংস্কৃত থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের কাছে তাঁর ঋণও যথেষ্ট। পরিভাষা ব্যবহারে তাঁর সীমাবদ্ধতা থাকলেও তিনিই আদি ব্যক্তিদের একজন— যিনি এদিকে আন্তরিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। এভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের সারিতে নিজেকে সামিল করেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করতে নিচের চারটি পদ্ধতির যে কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়—

ক) সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার কাঠামো অনুসরণ।

খ) ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজি ব্যাকরণ রচনার কাঠামো অনুসরণ।

গ) উল্লিখিত দুটো পদ্ধতির সংমিশ্রণে নতুন কোন পদ্ধতি অনুসরণ।

ঘ) খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার জন্যে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন।

রামমোহনের ব্যাকরণ রচনার কাঠামোয় মোটামুটি (ঘ) এরই প্রাধান্য। গৌড়ীয় ব্যাকরণে তিনি গৌড়ীয় ভাষারই আলোচনা করেছেন এবং সর্বাংশে গৌড়ীয় ব্যাকরণ নির্মাণের প্রচেষ্টাই তাঁর ছিল।[৩৩] ইংরেজি এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত হবার কারণে অনেক সময়ই তিনি (গ) এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের তত্ত্বে বাংলা ভাষার তথ্যকে মেলাবার চেষ্টা বর্তমানেও যেখানে প্রবল সেখানে রামমোহন অনেক বেশী পরিশুদ্ধ এবং অগ্রসরমান— এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ছয়— উপসংহার

অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা পিছিয়ে থাকা সমকালীন ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলতে সাধ্যমত সচেষ্ট ছিলেন। এ জন্যেই তাঁকে ধর্ম এবং সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। আধুনিক ভারতের ভিত্তিভূমি রচনা করবার জন্যে অসম্ভব নিষ্ঠায় তিনি নিজেকে প্রস্তুত ও সমর্পণ করেছিলেন। ভাষা ভাবনায়, ব্যাকরণ রচনায় এমনকি বাংলা গদ্য সৃজনেও রামমোহনের অগ্রসরমান চিন্তা-চেতনার সার্থক বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রজ্ঞার সঙ্গে আন্তরিকতার সুসমন্বয় এই কর্মবীরকে মহিমান্বিত করেছে। আর এ জন্যেই তিরোভাবের প্রায় পৌনে দুশো বছর পরও তাঁর কর্মই তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

টীকা

১ রামমোহন রায়ের জন্ম তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। ১৭৭২, ১৭৭৪ এবং ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ— এ তিনের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষণীয়। তবে ১৭৭৪ সালের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ যথেষ্ট জোরালো। রামমোহনের মনিব ও সুহৃদ জন ডিগবির উদ্যোগে লন্ডন থেকে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে Trans. of an Abridgment of the Vedant, . . . Likewise A Trans. Of the Cena Unpublished প্রকাশিত হলে এ গ্রন্থে রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয় তাতে ১৮১৭ সালে রামমোহনের বয়সকে ৪৩ বছর হিসেবে নির্দেশ করা হয়। একই সাথে ডিগবির সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তাঁর বয়স ২৭ বছর হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায়, ১৮০০ সালের ডিসেম্বরে ডিগবির ভারতবর্ষে আগমনের পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৮০১ সালে কলিকাতায় রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। এ দুটো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রামমোহনের জন্মসাল ১৭৭৪-কেই নির্দেশ করা সম্ভব। ১৭৭২ অথবা ১৭৮০ কে রামমোহনের জন্মসাল ধরা হলে ১৮০১ সালে তাঁর বয়স যথাক্রমে ২৯ অথবা ২১ দাঁড়ায়। দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০ : ১২; এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ৬।

২ তৎকালীন এ জাতীয় শিক্ষায়তনে কী ধরনের বিষয়ে পাঠ দান করা হত তাঁর আলোচনা লক্ষণীয় নিচের উদ্ধৃতিতে :

"টোল-চতুষ্পাঠিতে হিন্দুবিদ্যা— দর্শন, মীমাংসা, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি— শিক্ষা দেওয়া হত। আর মক্তব-মাদ্রাসায় হত আরবি, ফার্সি শিক্ষা।" দ্রঃ অরূপকুমার চট্টোপাধ্যায়, "রামমোহন ও তাঁর যুগ", পশ্চিমবঙ্গ— রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ১৫৯।

৩ দ্র. পূর্ণচন্দ্র বসু,"মহাত্মা রামমোহন রায়", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ৪৬।

৪ দ্র. বরুণকুমার চক্রবর্তী, "পত্রাবলীর আলোকে রামমোহন", পশ্চিমবঙ্গ— রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ১৮৮।

৫ বেশ কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তি রামমোহনের ইংরেজির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কবি টমাস মুর, কুমারী লুসী এবং বিশপ হেবার উল্লেখযোগ্য। মুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন—

"6th June 1831. Dined with Macdonald at eight. Company. Fazakar Aly. T. Baring. Wilmot Horton, Sir

A. Johnstine, Robert Grant, and the Brahman, Ram Mohan roy, a very remarkable man, speaking English perfectly, and . . ."

কুমারী লুসী ডাক্তার ক্যানিংকে যে সকল পত্র লিখেন, তার একটিতে (২৮ জুন, ১৮৩১) বলা হয়েছে—

"All accounts agree in representing him as a person of extraordinary merit. With very great intelligence and ability, he unites a modesty and simplicity which win all hearts. He has a very great command of the language".

১১ ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে রামমোহন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্রটি লিখেছিলেন তা বিশপ হেবারের মারফৎ প্রেরিত হয়েছিল। হেবার লিখেছেন—

"Rammohun roy, a learned native, who has sometimes been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this [Orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into lord Amharst's hands, and which, for his good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic." দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ১৯-২০ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০ : ৯৯।

৬ দ্র. প্রসিতাভ দাশ, "বাংলা গদ্যসাহিত্যে নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজর্ষি রামমোহন ও রচনাপঞ্জি", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ২১২।

৭ এটি তাঁর শুধুমাত্র ইংরেজিতে লিখিত প্রথম রচনাই নয়, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এটিই তাঁর প্রথম রচনাও বটে। অবশ্য গর্ভনকে লিখিত ১৮৩২ সালের পত্রে রামমোহন এ-ও লিখেছিলেন যে "When about the age of sixteen, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindoos." ধারণা করা হয়, হিন্দুদের পৌত্তলিকতা বিরোধী ১৭৮৭ সালের এ পুস্তিকাটি আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিল। 'মনজারাত্‌-উল-আদিয়ান' শিরোনামের এ পুস্তিকাটির পক্ষে প্রমাণসাপেক্ষ কোনও তথ্য দুর্লভ। সম্ভবত এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে বা বিনষ্ট হয়ে গেছে।

৮ বিলেতে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে অবশ্য কোন সুহৃদ ইংরেজের সংশোধন বা পরিমার্জন ছিল না। তিনি প্রায়ই কোন একটি বিষয় বলে যেতেন এবং পার্শ্ববর্তী কেউ সেটা লিখে নিতেন। লিখন শেষে প্রয়োজনে কখনো কখনো স্বহস্তে সেটা সংশোধন করতেন। বিলেত প্রবাসে হেয়ার সাহেবের ভাইয়ের বাসায়ও তিনি এমনটি করেছেন। ডাক্তার কার্পেন্টারের বক্তব্য থেকে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২৭০।

সুশীল কুমার দে রামমোহনের বাংলা রচনায়ও গৌরমোহন বিদ্যালংকারসহ তৎকালীন কোন কোন ধনী ও গুণী ব্যক্তির সাহায্য ও সংশোধনের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। দ্রঃ সুশীলকুমার দে, "রামমোহন রায়", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ৬৮।

এ ধারণার সত্যতায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

৯ "Rammohan Ray was the first Bengali who learnt English and also wanted his fellow countrymen to get the opportunity to acquire Western scientific education." [M.A. Qayyum 1982 : 113]

১০ দ্র. বরুণকুমার চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

১১ দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, "যুগগুরু রামমোহন", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ৮-১০; এবং শীলা বসাক, "রামমোহন ও নারীর স্বাধিকার", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ১৮৫

১২ দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, "যুগগুরু রামমোহন", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ১০ এবং মুকুলেশ বিশ্বাস (সংকলক), "রামমোহন রায়: জীবন ও জীবন কথা", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ২০৭

১৩ লেখক কর্তৃক উদ্বৃতি থেকে; দ্রঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ১৩

১৪ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ২৬৭

১৫ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২৬৯। ভাষাটির নাম এবং এ সম্পর্কিত কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

১৬ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ— রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ১৯

১৭ দ্র. রাজীব হুমায়ুন ১৯৯৩ : ১১২

১৮ রামমোহন রায় ছিলেন সুরাই মেলের ব্রাহ্মণ। বর্ধমান জেলায় এক সময় খানাকুল গ্রামটি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এটি হুগলি জেলার অন্তর্গত।

১৯ দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে এগুলোর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ববহ। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রধানত স্কুল পাঠ্য বাংলা বই প্রকাশের সমান্তরালে সংস্কৃত, আরবি ও ইংরেজি বইও প্রকাশ করত। ১৮৩০ সালের হিসেবে দেখা যায় এ বছর সোসাইটি ৯৬১৬-টি ইংরেজি এবং ১০,০৭৪টি বাংলা বই বিক্রয় করেছে। এ পরিসংখ্যান থেকে ইংরেজি শেখার আগ্রহ কী ব্যাপক ছিল সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির উদ্যোগেই কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর কাজ ছিল ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা। স্কুল সোসাইটির আদর্শ বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি শিখে ছাত্ররা হিন্দু কলেজে ভর্তি হত। পটলডাঙ্গায় সোসাইটির উদ্যোগে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে 'হেয়ার স্কুল' নামে খ্যাতি অর্জন করে। এ স্কুলে অধ্যয়ন করতে পারাকে ছাত্ররা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মূলত ইউরোপীয়দের দেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তুলবার জন্যেই স্থাপিত হয়েছিল।

২০ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২১২

২১ হিন্দু কলেজটি অবশ্য প্রথম একটি স্কুল হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে জনৈক গোরাচাঁদ বসাকের গৃহে, তারপর ফিরিঙ্গী কমল বসুর গৃহে এবং তারপর টেরেটি বাজারে এটি স্থানান্তরিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪ সালে পটলডাঙ্গায় সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট এবং ১৮২৬ সালে ঐ অট্টালিকায় স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর খোদিত লিপিতে হিন্দু কলেজ নামটি উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৪১ সালে ঢাকার, ১৮৪৫ সালে কৃষ্ণনগরের এবং ১৮৫৩ সালে বহরমপুরের সরকারি স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হবার পর থেকেই এখানে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন প্রভৃতি পাঠদানের ব্যবস্থা হয়।

২২ দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯

২৩ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ৩৮১-৩৮৩

২৪ দ্র. অঞ্জন বেরা, "রামমোহন রায় ও সাংবাদিকতা", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ: ১৪৮।

২৫ দ্র. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩৮১ : ২১৪

২৬ দৃষ্টান্ত ২ এ রামরাম বসু বাদসাহ, ওফাত, কাজিয়া, শওগাত, হুকুম, দাখিল ইত্যাদি আরবি/ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মৃত্যুঞ্জয় এবং রাজীবলোচনে রামরাম বসু থেকে অনেক বেশী সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

২৭ ১৮২৮ সালে রামমোহন রায় 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। এ উপাধি প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত তিনি 'দেওয়ানজী' নামেই পরিচিত ছিলেন।

২৮ লন্ডনের ইন্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীতে বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা ব্যাকরণের একটি হস্তলিখিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে। পুঁথিটির কোথাও পুঁথির কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় বিভিন্নভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে মোটামুটি ১৮০৬/০৭ সালের মধ্যে এটিকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এটি ১৯৭০ সালে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি গ্রন্থটির নাম দেন 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ'। নিজের মতকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে তিনি এ গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসেবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি উইলিয়াম কেরী রচিত 'ভাষাকথাক্রম' নামের একটি ব্যাকরণগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কৃত হয়ে ডঃ আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর পুষ্পিকায় লিখিত হয়েছে—

ভাষাকথাক্রম গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

মেস্তর উলিএম কেরি সাহেবের রচিত।

লিখক শ্রী রমাকান্ত দেব শর্ম্মণ। পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্চ।

ইংঙ্গরেজি শন ১৮১০ সাল তারিখ ১৬ আগস্ত বাঙ্গলা শন ১২১৭ শাল তারিখ ১ ভাদ্রে শুক্রবার মোঃ খিদিরপুর।

অধ্যাপক গণেশচরণ বসু ১৮৪৫-৪৬ সালে লিখিত প্রবন্ধে গ্রন্থটি কেরীর ১৮০১ সালে রচিত *A Grammar of the Bengalee language*-এর বাংলা অনুবাদ বলে মত প্রকাশ করেন। লিপিকর হিসেবে জনৈক শ্রী রমাকান্ত দেব শর্ম্মণের নাম উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থের কোথাও অনুবাদকের কোন নাম নেই। মনসুর মুসার ধারণা—— অনুবাদক সম্ভবত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। উইলিয়াম কেরী রচিত বাংলা অনুবাদগ্রন্থটির সাথে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ব্যাকরণগ্রন্থটির প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব যে ডঃ মুখোপাধ্যায় উক্ত গ্রন্থটিকে মৃত্যুঞ্জয় কর্তৃক লিখিত বলে যে ব্যাখ্যা করেছেন

তা প্রমাণিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় কোন বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেননি। সুতরাং রামমোহন রায়ই হচ্ছেন প্রথম বাঙালি বাংলা ব্যাকরণকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেকেই ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের A Grammar in English and Bengalee-কে বাঙালিকৃত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ বললেও প্রকৃত সত্য তা নয়। এটি বাংলা ভাষায় লেখা ইংরেজি ব্যাকরণ। এ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয়—

ক) মনসুর মুসা ১৯৮৪ : ১৯-৩২; এবং খ) নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৩ : ৩২; গ্রন্থ দুটোতে।

২৯ *The Modern Review* পত্রিকা ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে প্রবন্ধটি প্রকাশ করে।

৩০ দ্র. Report of the Calcutta School Book Society 1828, p-4.

৩১ রামমোহনই যে বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বাঙালি রচয়িতা তা ২৮ সংখ্যক পাদটীকার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ দ্র. দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ", পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা, পৃ. ১৭৫

৩৩ দ্র. দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণকুমার বসু (সম্)	বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা।
১৯৯২	সমতট প্রকাশন : কলকাতা।
কুমুদকুমার ভট্টাচার্য	রামমোহন-ডিরোজিও মূল্যায়ন।
১৯৮৫	বর্ণ পরিচয় : কলকাতা।
তরুণ ভট্টাচার্য (প্রধান সম্)	পশ্চিমবঙ্গ—রামমোহন সংখ্যা।
১৯৯৬	তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার : কলকাতা।
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।
১৩৮১	দে'জ পাবলিশিং : কলিকাতা।

নবেন্দু সেন ১৯৯০	বাংলা গদ্য স্টাইলিস্‌টিকস্‌। পুস্তক বিপণি : কলিকাতা।
নৃপেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৩	ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ। রত্নাবলী : কলিকাতা।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৭৯	রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : কলিকাতা।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০	রামমোহন রায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : কলিকাতা।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য (সম্) ১৯৫০	রামমোহন-গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : কলিকাতা।
মনসুর মুসা ১৯৮৪	ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। মুক্তধারা : ঢাকা।
রাজীব হুমায়ুন ১৯৯৩	সমাজভাষাবিজ্ঞান। বাংলাদেশ ভাষাতত্ত্ব-চর্চা পরিষদ এবং দ্বীপ প্রকাশন : ঢাকা।
সুখময় সেনগুপ্ত ১৯৮৫	বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙ্গালীর শিক্ষাচিন্তা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ : কলিকাতা।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৯০	মনীষী স্মরণে। জিজ্ঞাসা এজন্সিজ্ লিমিটেড : কলিকাতা।
M.A. Qayyum 1982	A Critical Study of the Early Bengali Grammars. The Asiatic Society of Bangladesh : Dhaka.
Rummohun Roy 1928	The English in India should adopt Bengali as their language. Modern Review.